সংবিধান সভা গঠন-মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব (Format of Constituent Assembly - Cabinet Mission Proposal)

সংবিধান সভার মূল নিহিত ছিল মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবের মধ্যে। ভারতীয় নেতারা যখন পূর্ণ স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের জন্য সাংবিধানিক সভার মাধ্যমে একটি সংবিধান দাবি করেছিলেন, তখন তা বিবেচনা করার জন্য সরকার ভারতে মন্ত্রী মিশন পাঠান। মন্ত্রী মিশন ভারতে পদার্পণ করে ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ। মন্ত্রী মিশন চেয়েছিল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের নির্বাচনের ভিত্তিতে সংবিধান সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হোক। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। স্থির হয়, প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ প্রতি দশ লক্ষ জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে একজন করে সদস্য নির্বাচন করবেন সংবিধান সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য। মনে রাখা দরকার, প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্র অংশের (১৪%) দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ও সংবিধান সভায় তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী হয়। সংবিধান সভায় মোট সদস্য ছিলেন ৩৮৯ জন। এঁদের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের সদস্য ছিলেন ২৯৬ জন ও বাকি ৯৩ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে। ব্রিটিশ ভারতের ২৯৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২০৮টি আসন। ২১০টি সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই দখল করেছিল ১৯৯টি আসন। তাছাড়া মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭৮টি আসনের মধ্যে ৩টি, পাঞ্জাবে শিখদের জন্য ৪টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ৩টি এবং কুর্গ, আজমের, মারওয়ার ও দিল্লি থেকে ৩টি আসন এসেছিল কংগ্রেসের অধিকারে। অন্যদিকে ৭৮টি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে লিগ দখল করেছিল ৭৩টি আসন।

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন বসে। ২০৭ জন সদস্য এই অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু মুসলিম লিগের সদস্যগণ এই অধিবেশনে যোগ দেননি। তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৪ জন মুসলিম সদস্য এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১১

ডিসেম্বর ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সংবিধান সভার স্থায়ী সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সংবিধান সভার সভাপতি হয়েই ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন যে, এই সভা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। এর পর ১৩ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু সংবিধান সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলে। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়, যাতে মুসলিম লিগ ও দেশীয় রাজ্যের সদস্যগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় ১৯৪৭ সালের ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সংবিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নেহরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৪৭-এর ২৮ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত। কিন্তু এতেও লিগ যোগদান করেনি। ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভাগ কার্যত অনিবার্য হয়ে পড়ে। মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান সভা একটি সার্বভৌম সভায় পর্যবসিত হয়। সংবিধান সভা একই সঙ্গে সংবিধান রচনা ও সাধারণ আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করে।

২৯ আগস্ট সংবিধানের খসড়া রচনা করার জন্য সংবিধান সভা একটি কমিটি গঠন করে। ড. বি. আর. আম্বেদকারের সভাপতিত্বে এই কমিটি সংবিধানের খসড়া রচনার কাজ শুরু করে। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আহ্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. মুনশি, সৈয়দ মহম্মদ শাহদুল্লাহ, এন, মাধব রাও, ভি. পি. খৈতান এবং বি. এল. মিশ্র। বি. এল. মিশ্র অবশ্য কমিটির

Edit with WPS Office

প্রথম অধিবেশনের পর থেকে এই কমিটির সঙ্গে আর যুক্ত ছিলেন না। ১৯৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রকাশ করে। এর পর জনগণের বিচারের জন্য ও নতুন কোনো প্রস্তাব দেবার জন্য ৮ মাস সময় দেওয়া হয়।অবশেষে ৫ নভেম্বর সংবিধানের খসড়া সংবিধান সভায় আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। সংবিধানের প্রতিটি ধারা সংবিধান সভায় খুঁটিয়ে দেখা হয়। খসড়া সংবিধানের উপর ৭৬৩৫টি সংশোধনী প্রস্তাব ওঠে। এর মধ্যে ২৪৭৩টি প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়। অবশেষে ২ বছর ১১ মাস ও ১৮ দিনের পর ২৬ নভেম্বর ভারতের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানের কিছু কিছু ধারা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরোপুরি এই সংবিধান চালু হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ওই দিন ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। গণতন্ত্র এই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ বলে স্বীকৃত হয়। এই সংবিধান অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রে একটি সরকার ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক সরকারের সহাবস্থান স্বীকৃত হয়।

১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু সংবিধান সভার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে এবং জনগণই হবে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। ভারতের প্রতিটি মানুষের থাকবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও সুবিচার। আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমানভাবে দেখা হবে এবং প্রত্যেক মানুষের থাকবে সমান সুযোগ, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ও নিজ ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সমাজের অনগ্রসর মানুষ, আদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে। সংবিধান রচনার কাজ অবশ্য সহজে বা বিনা বিতর্কে সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন জটিল জাতীয় প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংবিধান সভার সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল। সংবিধান সভার ১১টি অধিবেশনে মোট ১৬৫ দিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে ১১৪ দিন ব্যয়িত হয়েছিল খসড়া সংবিধান খুঁটিয়ে দেখার জন্য। নেহরু, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতা এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। যেসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তার মধ্যে মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা ও আসন সংরক্ষণ, কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তাঁর ক্ষমতা, জাতীয় ভাষা, আসামের পার্বত্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবস্থা ইত্যাদি ছিল প্রধান। এইসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সময় সময় যথেষ্ট উত্তেজনা ও উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে যে সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান হয়েছিল বা সিদ্ধান্তগুলি সবাই খোলা মনে মেনে নিয়েছিলেন, তা নয়। অনেক বিষয়ই পরে জটিল আকার ধারণ করেছিল।

সংবিধান সভার প্রকৃতি ও চরিত্র কেমন ছিল বা কারা আমাদের সংবিধান রচনা করেছিলেন, এবার আসা যাক সেই প্রশ্নের আলোচনায়। সংবিধান সভার সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দেশপ্রেম ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড়ো মূলধন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন পেশায় আইনজীবী। এই কারণেই অনেক সময় বলা হয় ভারতের সংবিধান হচ্ছে আইনজীবীদের স্বর্গরাজ্য। তাঁরাই এই সংবিধানের খসড়া রচনা করেছেন, তাঁদের নিজেদের সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য। (The Indian Constitution is a lawyer's paradise, drafted by lawyers for the benefit of lawyers.৩) সংবিধান সভার সদস্যরা সমাজের বিভিন্ন স্তর ও পেশা থেকে এলেও সাধারণভাবে এই সভা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিত্তশালী। এঁদের মধ্যে অনেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন অনুযায়ী যখন ১৯৩৭ সালে

Edit with WPS Office

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ অধিকার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজ আমলে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন ও পেশায় অনেকেই ছিলেন কৃতী ও সফল। সংবিধান সভার সদস্যগণ সমাজের যে স্তর থেকেই আসুন না কেন, তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

সংবিধান প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি; নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং জওহরলাল। তিনি তাঁর ১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বরের ভাষণে সংবিধানের লক্ষ্য, দর্শন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তা গৃহীত হয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান ছিল সংবিধান সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সমবেত করা। তাছাড়া ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে যাতে আসন সংরক্ষণ না হয়, সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। বলা বাহুল্য, প্যাটেলের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান সভার সভাপতি হিসাবে নিরপেক্ষতা ও মর্যাদার প্রতীক ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংবিধান সভার সম্পদ। সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকার। সংবিধান রচনায় ড. আম্বেদকারের পাণ্ডিত্য ও আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর দক্ষতার সাহায্য নিতে স্বয়ং গান্ধি আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। নেহরু ও প্যাটেলও আম্বেদকার সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আসলে সংবিধান সভার লক্ষ্য ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের দক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও এক কথায়, শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। সংবিধান সভায় ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব রকম সদস্যের ঠাঁই হয়েছিল। হিন্দু, মুসলিম ও শিখ ছাড়া খ্রিস্টান, পার্সি, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, অনুন্নত সম্প্রদায়, মহিলা- প্রত্যেকেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল। একইভাবে কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলের সদস্যরাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। যেমন, ড. আম্বেদকার কংগ্রেস সদস্য ছিলেন না। সংবিধান সভায় অন্যান্য যারা নজরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজাগোপালাচারি, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, টি. টি. কৃষ্ণমাচারি ইত্যাদির নাম আমাদের মনে আসে। আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ড. রাধাকৃষ্ণন।

সংবিধান সভা যেভাবে গঠিত হয়েছিল, অনেকেই তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এঁদের মতে সংবিধান সভায় জনমত যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি, কারণ সংবিধান সভার সদস্যগণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়নি। এর সদস্যরা ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী পরোক্ষভাবে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে সংবিধান সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমে আসেননি। গণভোটের দ্বারাও সংবিধান সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। আবার অনেকে এ কথাও বলেন যে, ভারতের সংবিধানের আইনগত উৎস হল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। ভারতীয় জনগণের কোনো ভূমিকাই সেখানে ছিল না। আবার অনেক সময় এও বলা হয় যে, সংবিধান সভা ছিল এমন একটি সমাবেশ যেখানে একটিমাত্র দলের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ("The Constituent Assembly was a one party body in an essentially one party country. The Assembly was the Congress and the Con-gress was India."8)

উপরের সমালোচনাগুলি পুরোপুরি ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিক নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সংবিধান সভা নির্বাচিত হয়নি। এমনকী যে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে সংবিধান সভার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাও জনগণের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান প্রণেতাদের পক্ষে ভারতীয় জনগণের অভিমত যাচাই করা আদৌ

Edit with WPS Office

সম্ভবপর ছিল কিনা, তা গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান সভা গঠন করতে হলে অনেক সময় লাগত। অন্যদিকে ১৯৫২ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা এই সংবিধান অনুমোদন করায় এই সংবিধানে ভারতীয় জনগণের অভিমত প্রতিফলিত হয়নি, এ কথা বলা যায় না। তাছাড়া সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হননি বলেই যে সংবিধান সভার সদস্যরা সামগ্রিকভাবে জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেননি, এ ধারণা সঠিক নয়। মনে রাখা দরকার, সংবিধান সভার সদস্যগণ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। দেশপ্রেমে উৎসর্গীকৃত এইসব মানুষ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হননি। ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ও স্বার্থ। অন্যদিকে এ কথাও সত্য যে, সংবিধান সভায় নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেসি নেতাদের মুখ্য ভূমিকা থাকলেও কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দল ও মতের নেতারাও এই সভায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং কংগ্রেস তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিল। সংবিধানের প্রাণপুরুষ আম্বেদকার কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও কংগ্রেসে ছিলেন না। আসলে সংবিধান রচনায় জোর দেওয়া হয়েছিল দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর; কোনো দল ও ব্যক্তিবিশেষের কথা মাথায় রাখা হয়নি। দেশ ও জনগণের স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে যে দ্রুততার সঙ্গে সংবিধান সভা কাজ করেছিল, তার জন্য অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে। সংবিধান সভার সদস্যদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না।

Edit with WPS Office

দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির (Integration of princely states):

নেহরুর সামনে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বয়ং জিন্না ১৯৪৭ সালের ১৮ জুন ঘোষণা করেছিলেন যে দেশীয় রাজারা ইচ্ছা করলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে পারবেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে এই অবস্থান মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অসংখ্য দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন অবস্থিতি ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতির পরিপন্থী ছিল। তাছাড়া দেশীয় রাজ্যের জনগণও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং তাদের মতামতও উপেক্ষা করা সমীচীন ছিল না। যাইহোক, কোনো কোনো দেশীয় রাজা কিছুটা বাস্তববোধ এবং কিছুটা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এবং হয়তো বা কিছুটা দেশপ্রেমের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে সংবিধান সভার অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই তা করেননি এবং ত্রিবাঙ্কুর, ভূপাল ও হায়দরাবাদ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির দায়িত্বে ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁর সচিব ছিলেন ভি.পি. মেনন। অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইটালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে ক্যাভুর ও বিসমার্কের ভূমিকার সঙ্গে তাঁর ভূমিকা তুলনা করলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য ইটালি বা জার্মানির সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতির অনেক অমিল ছিল। যাইহোক, দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির পিছনে প্রথমে কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। সর্দার নিজে স্বীকার করেছেন যে, এই ঘটনা ঘটেছিল আকস্মিক ভাবে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে জাতীয়তাবাদের প্রসার তাঁর কাজকে কিছুটা সহজ করে দিয়েছিল। এই কাজ প্রথমে শুরু হয়েছিল উড়িষ্যায়। পরে তা ভারতের অন্যত্র অনুসৃত হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির পরিকল্পনার জনক ছিলেন উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতা হরেকৃষ্ণ মহতাব। ১৯৩৮ সালে তিনি উড়িষ্যার জনগণকে নিয়ে রাজ্য প্রজামন্ডল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যার ছোটো ছোটো দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে নিয়ে আসার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। কিন্তু তখনই এই বিষয়ে কোনো কিছু করা সম্ভব হয়নি। ভারত স্বাধীন হবার পর মহাত্মা গান্ধি ও প্যাটেলকে তাঁর প্রস্তাবের যথার্থতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, উড়িষ্যা থেকেই দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির পরিকল্পনা সূচিত হোক। প্রথম দিকে দেশীয় রাজারা কিছুটা অনিচ্ছুক হলেও প্রজামন্ডলের আন্দোলনের চাপে তাঁরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং নির্বিঘ্নে তাঁদের রাজাগুলি উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর ছত্তিশগড়ের দেশীয় রাজারাও মধ্যপ্রদেশের (Central Provinces) সঙ্গে যুক্ত হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির জন্য Instrument of Accession নামে একটি দলিল সম্পাদিত হয়। ভারতভুক্তির মূল্যস্বরূপ যোগদানকারী রাজাদের বিশাল ভাতা প্রদান ও খেতাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত জুনাগড়, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগ দেয়। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি মুসলিম প্রধান রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দেয়।

সৌরাষ্ট্র উপকূলে জুনাগড় ছিল একটি ছোটো দেশীয় রাজ্য। দেশটি সম্পূর্ণরূপে ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। এখানকার প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দু। কিন্তু শাসক ছিলেন মুসলিম। এই অবস্থায় জুনাগড়ের ভারতভুক্তি ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যেহেতু নিয়ম অনুসারে দেশীয় রাজ্যের রাজারা তাঁদের ইচ্ছামত ভারত কিংবা পাকিস্তান যে-কোনো রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারতেন, সেহেতু এখানকার মুসলিম শাসক পাকিস্তানে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিকে জুনাগড়ের মানুষ ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন। এই অবস্থায় এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নেহরু ও প্যাটেল উভয়েই গণভোটের

Edit with WPS Office

মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। জিন্না ছিলেন জুনাগড়ের ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান জুনাগড়ের নবাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তি মেনে নেয়। কিন্তু প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের ফলে নবাব জুনাগড় থেকে পালিয়ে করাচিতে আশ্রয় নেন। জুনাগড়ে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জুনাগড়ের দেওয়ান শাহ নওয়াজ ভুট্টো (জুলফিকর আলি ভুট্টোর পিতা) এই অবস্থায় ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী জুনাগড়ে প্রবেশ করে। ১৯৪৮ সালে এখানে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই ভোটের রায়ে জুনাগড়ের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হয়।

হায়দরাবাদের সমস্যা ছিল জটিলতর এবং বিখ্যাত সাংবাদিক দুর্গা দাস যথার্থই বলেছেন যে, হায়দরাবাদ ছিল প্যাটেলের কাছে সবচেয়ে বড়ো 'চ্যালেঞ্জ'। হায়দরাবাদ ছিল অন্যতম বৃহৎ একটি দেশীয় রাজ্য এবং নিজাম ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। ১৯৪৭-৪৮ সালে তাঁর বাৎসরিক আয়-ব্যয় ছিল মোটামুটি বেলজিয়ামের সমতুল এবং সেই দিক থেকে বিচার করলে হায়দরাবাদ একটি স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা দাবি করার অধিকারী ছিল। তবে হায়দরাবাদ ছিল চতুর্দিকে ভারত বেষ্টিত। কাজেই স্বাধীন ভারতে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবাস্তব ছিল। জুনাগড়ের মতো হায়দরাবাদের শাসক বা নিজাম ছিলেন মুসলিম। কিন্তু প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দু। স্বাভাবিক কারণেই নিজামের প্রজারা ছিল ভারতভুক্তির পক্ষে। কিন্তু নিজাম ভারতে যোগদান না করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার পিছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। তাঁর উপদেষ্টারাও ছিলেন পাকিস্তানের সমর্থক। এমনকী নিজাম পাকিস্তানে যোগদান করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। এদিকে রাজাকার নামে এক উগ্র সাম্প্রদায়িক বাহিনী নিজামের হিন্দু প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। এই অবস্থায় প্যাটেল হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেন। তাঁর ভাষায় হায়দরাবাদ ছিল দাবার ছকের রাজা। তাই যেনতেন প্রকারে হায়দরাবাদ দখল ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। হায়দরাবাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে অর্থনৈতিক অবরোধের অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। তখন একটি প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, হায়দরাবাদের মানুষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেওয়া হোক, যাতে তারা নিজামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু এই প্রস্তাবে প্যাটেলের সায় ছিল না। এদিকে একই সঙ্গে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানায় এক কৃষক বিদ্রোহ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। তাদের লক্ষ্য ছিল গ্রামাঞ্চল থেকে ভূস্বামীদের উৎখাত করে একটি মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা এবং সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। এই অবস্থায় জনমত ছিল হায়দরাবাদ সমস্যার দ্রুত সমাধানের পক্ষে। জনগণ চাইছিল একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। প্যাটেল মনে করেন বলপ্রয়োগ করতে হলে তা সরকারেরই করা উচিত। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তিনি ভারত ছেড়ে চলে যান। এদিকে খবর আসে নিজাম নাকি পোর্তুগিজদের কাছ থেকে গোয়া কিনে তাঁর স্থলবেষ্টিত রাজ্যের সঙ্গে জলপথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আরও খবর আসে তিনি নাকি জিন্নার সমর্থন পাবার আশায় পাকিস্তান সরকারকে ২০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়েছেন। এই অবস্থায় প্যাটেল নেহরুকে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং তাতে যদি নিজাম বাধা দেন, তার জন্য তিনি তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেন। নেহরু এই প্রস্তাবে রাজি হলেও গড়িমসি করতে থাকেন। নেহরুর আশঙ্কা ছিল এর ফলে হয়তো পাকিস্তান হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লৌহমানব কারও কথায় কর্ণপাত না করেই ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরির তৎপরতায় নিজামের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তিন দিন পরে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এদিকে পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে হায়দরাবাদ সমস্যা তুললেও তাতে কোনো লাভ হয়নি। এর পর গণভোটের মাধ্যমে হায়দরাবাদের ভারতভক্তি সম্পূর্ণ হয়। ১৯৪৯ সালে নিজাম হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি মেনে নেন এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি হায়দরাবাদ

Edit with WPS Office

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অঙ্গীভূত হয়। পরে ১৯৫৬ সালে যখন ভারতের প্রাদেশিক পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেওয়া হয়, তখন হায়দরাবাদের কিছু অংশ যায় বোম্বাই প্রদেশে (বর্তমান মহারাষ্ট্র), কিছু অংশ যায় মহীশূর প্রদেশে (বর্তমান কর্ণাটক) এবং বাকি অংশ যায় অন্ধ্রপ্রদেশে। ভারত সরকার নিজামের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। রাজ্যের প্রধান বা রাজপ্রমুখ হিসাবে নিজাম স্বীকৃত হন; তাঁর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা রাজন্যভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং তাঁর অগাধ সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি অবশ্যই প্যাটেলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছিল। কাশ্মীর সমস্যা ছিল জটিলতম এবং আর্জও এই সমস্যার নিষ্পত্তি হয়নি। কাশ্মীরের রাজা

ছিলেন হিন্দু; কিন্তু প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলিম (৭৬-৪%)। তবে কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও জম্মুতে বহু হিন্দু বাস করত এবং লাদাখের জনসংখ্যার একটি অংশ ছিল বৌদ্ধ। কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কাশ্মীরের দিকে তাই অনেকেরই নজর ছিল। কাশ্মীরের সীমারেখা স্পর্শ করেছিল আফগানিস্তান, রাশিয়া, চিন ও তিব্বত। কাজেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের কাছেই কাশ্মীরের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারত বা পাকিস্তান কোনো রাজ্যেই যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। এদিকে কাশ্মীর রাজ্য পরিষদ ও তার নেতা শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাতে নেহরুর সায় ছিল। হরি সিং অবশ্যই এর বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারতে কোনো মতৈক্য ছিল না। মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ দিক। প্যাটেলেরও এই বিষয়ে খুব একটা আপত্তি ছিল না। তাঁর কাছে হায়দরাবাদ ও জুনাগড় ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নেহরুর এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক দুর্বলতা ছিল। মাউন্টব্যাটেনের পত্নী এডিনা মাউন্টব্যাটেনের কাছে নেহরু তাঁর এই দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন-"It (Kashmir) is a kind of mild intoxication-like music sometimes or the company of a beloved person." তাছাড়া ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে তিনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর দৃষ্টিতে কাশ্মীর ছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সংহতির প্রতীক। কাশ্মীর রাজ্য পরিষদ বা National Conference-এর নেতা শেখ আবদুল্লাহও ছিলেন কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পক্ষে। এই অবস্থায় প্যাটেল তাঁর মত পরিবর্তন করেন। কিন্তু পাকিস্তানের দিক থেকে জিন্নার ধৈর্য সইছিল না। এইসব মিলিয়ে কাশ্মীর পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে।

ভারত স্বাধীন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্মীর সমস্যার সূচনা হয়। ঘটনার সূত্রপাত হয় পাক মদতপুষ্ট এক উপজাতীয় সেনাবাহিনীর কাশ্মীর আক্রমণকে কেন্দ্র করে (অক্টোবর, ১৯৪৭)। উপজাতি আক্রমণে মাহোরার বিদ্যুৎকেন্দ্র ভস্মীভূত হয়, বারামুলা অধিকৃত হয়, এমনকী কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরও বিপন্ন হয়। হরি সিং শ্রীনগর থেকে পালিয়ে জম্মুতে আশ্রয় নেন। হরি সিং-এর পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ভারতও এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না বা যতক্ষণ না কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ ভারতের পক্ষে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিছুটা অসুবিধাজনক ছিল। পরিস্থিতির চাপে বিপন্ন হরি সিং ভারতের সাহায্যপ্রার্থী হন। এই অবস্থায় হাল ধরেন প্যাটেল। এর আগে অবশ্য নেহরু তাঁর সঙ্গে ও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গেও পরামর্শ করেন। হরি সিং ভারতে যোগদান করতে সম্মত হন এবং Instrument of Accession-এ স্বাক্ষর করেন (২৬ অক্টোবর)। এর পরই ভারতীয় ডাকোটা বিমানে সেনাবাহিনী শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হয়। এইসব কিছুর পিছনেই গান্ধির সমর্থন ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। শ্রীনগর ও উপত্যকা হানাদারদের

Edit with WPS Office

কবলমুক্ত হয়। কিন্তু এর পর পাক সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে নেয়। যাইহোক, এইভাবে কাশ্মীর ভারতভুক্ত হয় এবং শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশানাল কনফারেন্স ভারতের এই নীতিকে সমর্থন জানায়। বলা বাহুল্য, জিন্না এতে খুশি হননি কিন্তু এখানেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়নি। নেহরু অবশ্য এই ভেবে আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলেন

যে, এর ফলে তিনি কাশ্মীরকে এক চরম সংকট থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের আক্রমণ ও অন্তর্ভুক্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন যে, সমস্ত ধর্মের মানুষ কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসায় তা এক ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সংহতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এর ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল। তিনি তাঁর এই অনুভূতির কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলিকে জানিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না ও পাক প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা মনে করেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ছিল সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে না। যুদ্ধ চলাকালীন, এমনকী ভারত যখন জিতছিল, তখন নেহরু মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করেন। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। ভারত যখন সুবিধাজনক অবস্থায় এবং যুদ্ধে জিতছে, তখন নেহরু এইভাবে কেন বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনলেন, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। একটু ধৈর্য ধরে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেই পাকিস্তান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হত বলে তাঁরা মনে করেন। তাছাড়া এইভাবে বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করায় কাশ্মীর সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়। জুডিথ ব্রাউন লিখেছেন-"In the light of subsequent events the wisdom of Mountbatten's strong advice to Nehru to involve the UN is questionable. It internationalised the whole problem, eventually involving Kashmir in the international politics of the Cold War...." অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন- "বড়লাটের পরামর্শে কাশ্মীরের প্রশ্ন U.N.O.-তে তুলে মহা ভুল করলেন নেহরু। আজও তার জের চলছে।" এই বিষয়ে নেহরুর যুক্তি ছিল যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে ভারতের পক্ষে ক্ষতি হত এবং ১৯৪৮ সালের শেষে প্রচণ্ড ঠান্ডায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। তাছাড়া তিনি চেয়েছিলেন নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তান সরকারকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত ও সংযত করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং দেখা গেল ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবিত নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের পক্ষেই কথা বলছে এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে যুদ্ধবিরতির রেখা বরাবর কাশ্মীরকে কার্যত দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। আজাদ কাশ্মীর আজও পাকিস্তানের দখলেই আছে। নিরাপত্তা পরিষদে যাওয়া যে ভুল হয়েছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকায় যে তিনি হতাশ হয়েছেন, তা নেহরু পরে তাঁর ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে লেখা একটি চিঠিতে স্বীকার করেছেন।

১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কমিশন যেসব সুপারিশ করেছিল, তাতে পাক বাহিনীকে আজাদ কাশ্মীরসহ সমগ্র কাশ্মীর থেকে সরে আসার কথা বলা হয়। ভারতকেও অনুরূপভাবে তার সেনাবাহিনীর একটি বড়ো অংশ প্রত্যাহার করতে বলা হয়। শান্তিরক্ষার জন্য একটা নূন্যতম ফৌজ রাখার কথা বলা হয়। ঠিক হয়, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত তার সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশ প্রত্যাহার করে নিলেও পাকিস্তান তার কথা রাখেনি। আসলে ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেও কোনো সন্ধি হয়নি। নেহরু কিন্তু ক্রমশই উপলব্ধি করছিলেন যে, কাশ্মীর সমস্যা ঠান্ডা লড়াই-এর প্রেক্ষাপটে এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হতে চলেছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী একটু আন্তরিকভাবে

Edit with WPS Office

ভারতের ন্যায়সংগত দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হলে এবং পাকিস্তানকে সংযত হতে পরামর্শ দিলে কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হত। তবু নেহরু নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা মেনে নিতে রাজি ছিলেন। ১৯৫১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি সিদ্ধান্তে স্থির করে যে, পাকিস্তান তার অধিকৃত অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেবার পর জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করায় শেষ পর্যন্ত গণভোট সম্ভব হয়নি। সেই থেকে কাশ্মীর সমস্যা আজও ভারত ও পাকিস্তানের স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড়ো অন্তরায় হয়ে আছে। ভারত আগাগোড়াই বলে আসছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য। অন্যদিকে পাকিস্তান ভারতের এই দাবি মানতে আজও অনিচ্ছুক। যুদ্ধবিরতির সময় পাকিস্তান কাশ্মীরের যে অংশ দখলে রেখেছিল, যা আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত, তা এখনও তার অধিকারেই আছে এবং তখন যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিত হয়েছিল, বর্তমানে তাই ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখায় পরিণত হয়েছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে জুনাগড়, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর ছিল প্রধান সমস্যা। শেষটির চূড়ান্ত সমাধান না হলেও আজও তা ভারতেরই অধীন (আজাদ কাশ্মীর ছাড়া)। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি নিয়ে এত জল ঘোলা হয়নি, যদিও কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। লৌহমানব প্যাটেল ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কাজ হাতে নেন এবং অত্যন্ত দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেন। ছোটো ছোটো ২১৬টি রাজ্যকে সন্নিহিত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আবার ৩১৬টি দেশীয় রাজ্যকে একসঙ্গে যুক্ত করে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত করা হয়। এইভাবে মধ্যভারত, রাজস্থান, পাতিয়ালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য (PEPSU), সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন গঠিত হয়। বড়ো রাজ্য হিসাবে মহীশূর, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর তাদের স্বতন্ত্র পূর্বতন অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তরের মূল্যস্বরূপ দেশীয় রাজাদের করমুক্ত মোটা টাকার রাজন্যভাতার ব্যবস্থা করা হয়, ১৯৪৯ সালে যার পরিমাণ ছিল ৪.৬৬ কোটি টাকা। তাছাড়া সাবেকি আইন অনুসারে উত্তরাধিকার, উপাধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি সুযোগসুবিধাও অব্যাহত রাখা হয়।

দেশীয় রাজন্যবর্গকে এইসব ঢালাও সুযোগসুবিধা দেবার জন্য অনেকেই কঠোর সমালোচনা করেছেন। এর ফলে স্বাধীন ভারতে একটি বিশেষ অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষত, ভারতের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে রাজন্যবর্গের জন্য দেয় বিপুল পরিমাণ ভাতা এক বিশাল অর্থনৈতিক বোঝার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঠিক স্বাধীনতার পরেই দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সে-কথা মাথায় রাখলে অনেকেরই এই কঠোর সমালোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত। পরে রাজন্যভাতাসহ অনেক সুবিধাই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই উত্তেজক মুহূর্তে তা করলে এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারত। অন্যদিকে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও স্বৈরতন্ত্রী ও অত্যাচারী শাসনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির জন্য লৌহমানব প্যাটেলের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় এবং সমস্ত প্রকার বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর এই মহান ভূমিকার কথা স্মরণ করে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন- “সর্দার প্যাটেল যদি না দৃঢ় হস্তে হায়দরাবাদ সহ শত শত দেশীয় রাজ্যকে ভারতভুক্ত করতেন, তবে আজ আমাদের দশা হত বাল্কানের মতো। ব্রিটেনের টোরিরা, স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন, তাই চেয়েছিলেন।"৮ প্যাটেলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সচিব ভি. পি. মেননের অবদানও স্বীকার করতে হবে। বস্তুত, উভয়ের দ্বৈত প্রচেষ্টার ফলেই এই কাজ এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁরা এগিয়েছিলেন ধীর কিন্তু সতর্ক গতিতে।

Edit with WPS Office

প্রথমে তাঁরা দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে কেবল প্রতিরক্ষা, বিদেশ নীতি ও পরিবহণ বা যোগাযোগ দাবি করেছিলেন। একবার এই দাবি আদায় করার পরই তাঁরা আস্তে আস্তে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্থাপন করেন।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে গেলেও করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডিচেরি, মাহে ইত্যাদি এবং পশ্চিমবঙ্গে চন্দননগর তখনও ফরাসিদের অধীনে ছিল। পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দমন ও দিউ ছিল পোর্তুগিজদের অধীনে। এইসব অঞ্চলের মানুষও স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ছিল এবং স্বাধীন ভারতে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিল। ফরাসি সরকারও বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করতে অনিচ্ছুক ছিল না। ১৯৫৪ সালে ফরাসিরা তাই গৌরবের সাথে পন্ডিচেরি, চন্দননগর ও ফরাসি অধিকৃত অঞ্চল থেকে চলে যায়। কিন্তু পোর্তুগাল এই উদারতা দেখাতে রাজি ছিল না। তারা নিজেদের অধিকৃত অঞ্চল সহজে ছেড়ে দিতে চায়নি। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পোর্তুগালের পক্ষে। ভারত সরকার প্রথমে বলপ্রয়োগ করে পোর্তুগিজদের অধিকৃত স্থানগুলি দখল করতে চায়নি। এদিকে গোয়ার জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু গোয়া সরকার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই আন্দোলন দমন করে। ভারত থেকে একদল সত্যাগ্রহী গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেয়। কিন্তু এই আন্দোলনও ব্যর্থ হয়। অবশেষে নিরুপায় নেহরু গোয়া দখলের জন্য সেনাপতি জয়ন্ত চৌধুরির নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৯৬১ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়া অধিকার করে। বিনা যুদ্ধে গোয়ার পোর্তুগিজ গভর্নর জেনারেল আত্মসমর্পণ করেন। এই সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সম্পূর্ণরূপে বিদেশি শাসনের অবসান হয়। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন অবলুপ্ত হয়।

Edit with WPS Office

ভারত-চিন সম্পর্ক ও পঞ্চশীল নীতি:

কোরিয়া সংকটে ভারত চিনের পাশে এসে দাঁড়ালেও চিনের সগৌরব অভ্যুত্থান যে বিশ্ব রাজনীতি এবং বিশেষভাবে এশীয় রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা আরোপ করেছিল, সে সম্পর্কে নেহরু সচেতন ছিলেন। এর ফলে শুধু কমিউনিস্ট দুনিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হয়নি; এশীয় মহাদেশে চিন প্রধান শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে চিন কর্তৃক তিববত অধিকার একটি অশুভ ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল এবং সর্দার প্যাটেল তাঁর মৃত্যুর আগে চিনের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ সম্পর্কে নেহরুকে সচেতন করে গিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে চিনের মাধ্যমে ভারতীয় কমিউনিস্টরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করতে পারে।

এক্ষেত্রে নেহরুর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথমটি চিনের সঙ্গে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব ও বোঝাপড়ায় অবতীর্ণ হওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করা। তবে সেক্ষেত্রে তার অর্থ ছিল জোট নিরপেক্ষ নীতির অবসান। অপর পথটি হল চিনের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলে তার মন জয় করা। চিনের বিরুদ্ধে মার্কিন সাহায্যের রাস্তা সব সময়েই খোলা ছিল। নেহরু ইচ্ছা করলে মার্কিন-জাপ শান্তি চুক্তির (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) অংশীদার হতে পারতেন। নেহরুর ভগ্নী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁকে সেই রকম পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু পানিক্কর, রাধাকৃষ্ণন ও কৃষ্ণ মেনন (যথাক্রমে চিন, সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত) এর বিরোধী ছিলেন। নেহরু নিজেও এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিনি এই চুক্তির মধ্যে মার্কিন সমরবাদের আভাস পেয়েছিলেন। এর ফলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে বলেও তিনি মনে করতেন। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন এই চুক্তির বিরোধী ছিল, কারণ এই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে একটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারত। নেহরু এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃত হন। তিনি একটি চিঠিতে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে লিখেছিলেন- "To accept the Japanese treaty as it is now is to put an end to our present policy..."১২ স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর ফলে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তবে চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়ান এতে খুশি হয়েছিল।

এই অবস্থায় নেহরু দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ চিনের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। আসলে শান্তিপূর্ণ পথে সমস্ত সমস্যার সমাধান ছিল তাঁর মূল নীতি, কারণ ভারতে গণতন্ত্রের বিকাশ ও আর্থিক উন্নয়নের প্রধান শর্তই ছিল বিশ্বশান্তি। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরস্পরবিরোধী দুই শিবিরের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে চেয়েছিলেন, যদিও এই কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন। এই জন্যই তিনি চিনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে চাননি। শান্তিপূর্ণ পথে তিনি চিন-ভারত সমস্যার মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে বেজিং-এ চিনের সঙ্গে ভারতের এক বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই বছর ২৮ জুন নেহরু ও ঝাও-এন-লাই এক যৌথ বিবৃতিতে সহাবস্থানের কথা ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ফরাসি ইন্দোচিনে (লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম) হো চি মিনের নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল, তাতে দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে (৭ মে, ১৯৫৪)। জেনেভা সম্মেলনে ফ্রান্স ইন্দোচিন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট শাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। নেহরুও সাম্যবাদের প্রসার পছন্দ করেননি। তাই জোট নিরপেক্ষ নীতির অঙ্গ হিসাবে তিনি ইন্দোচিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন-কারোরই হস্তক্ষেপ কাম্য বলে মনে করেননি। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে, ইন্দোচিনে মার্কিন হস্তক্ষেপ চিন মুখ বুজে সহ্য করবে না এবং সেক্ষেত্রে কোরীয় সংকটের মতো আর একটি সংকট অনিবার্য হয়ে পড়বে। তিনি অবশ্য উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ২০ এপ্রিল মার্কিন রাষ্ট্রসচিব

Edit with WPS Office

ডালেস ওয়াশিংটনে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন্স, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোর্ডিয়ার রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে ২৮ এপ্রিল নেহরু ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে কলম্বো শহরে ইন্দোচিন সমস্যার সমাধানের জন্য সমবেত হন। এখানে ইন্দোচিন সমস্যা সমাধানে নেহরুর ছয় দফা শর্ত অনুমোদিত হয়। জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পিছনে নেহরুর এই ছয় দফা সূত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর ফলে ইন্দোচিনে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয় এবং লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। তবে ১৭০ অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েতনামকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আরও ঠিক হয় যে দু-বছর' পরে এখানে অবাধ ও গোপন ভোটের মাধ্যমে দুই ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হবে। যুদ্ধ-বিরতি, বন্দিবিনিময় ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভারতের সভাপতিত্বে তিন দেশের (ভারত, কানাডা ও পোল্যান্ড) একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়। ইন্দোচিন সমস্যা সমাধানে নেহরুর ভূমিকা খুব গৌরবোজ্জ্বল ছিল এবং এর ফলে তাঁর মর্যাদা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে, লাওস ও কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা চিন স্বীকার করে নেয় এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স চিনকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা এই অঞ্চল ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দেবে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান হয়নি। জেনেভা সম্মেলনের ফলে চিন ও ভারত অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল এবং উভয়ের মধ্যে মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হয়। এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রেরও চিন সম্পর্কে উদ্বেগ ও আশঙ্কা কিছুটা প্রশমিত হয়। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী ঝাও-এন-লাই ভারতে আসেন। এই সময়ে চিন-ভারত সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য গৃহীত হয় 'পঞ্চশীল' নীতি। এই নীতিগুলি হল-(১) উভয়ের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মর্যাদা প্রদান (২) অনাক্রমণ; (৩) একে অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে না-হস্তক্ষেপ; (৪) সাম্য ও' পারস্পরিক সহায়তাদান ও (৫) শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। বাণিজ্যিক চুক্তি ও পঞ্চশীলের মাধ্যমে নেহরু চিন-ভারত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন এবং এর ফলে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এর ফলে তিববত ও ভারতের মধ্যে যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুরক্ষিত হবে, তেমনই চিন ভারতের কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এই বিষয়ে পরে অবশ্য তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল।

শুধু চিন নয়, জোট নিরপেক্ষতার অঙ্গ হিসাবে নেহরু এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সঙ্গেও শুধু সুসম্পর্কই গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না; তিনি চেয়েছিলেন তাদের সংঘবদ্ধ করে এমন একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে, যার ফলে পশ্চিমি রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ভূখণ্ডে ৬১৯৭মাথা তুলতে না পারে। এশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রজোট গঠন (SEATO ও বাগদাদ চুক্তি) শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগের কারণ ছিল। এশীয় কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিন নিয়েও ভাবনাচিন্তার অবকাশ ছিল। এশীয় ভূখণ্ডে চিনের মতিগতি নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি উদ্বিগ্ন ছিল। নেহরু এই বিষয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী ছিলেন। তাই জোট নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও তিনি চিনকেও একটি সম্মেলনে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। নেহরুর এইসব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে বান্দুং-এ (ইন্দোনেশিয়া) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে।

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের পথ প্রদর্শক ছিলেন অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ। ১৯৫৩ সালেই তিনি এই ধরনের সম্মেলনের কথা ভেবেছিলেন। বান্দুং সম্মেলনের ঠিক আগেই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ার ১৪টি দেশের এক সম্মেলনের মাধ্যমে যেন এর মহড়া হয়েছিল। এই সমাবেশে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে পারস্পরিক

Edit with WPS Office

ঐক্য ও সংহতির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। বান্দুং সম্মেলনে এশিয়ার ২৩টি ও আফ্রিকার ৬টি দেশ অংশ নিয়েছিল। এই সমাবেশে সমাজতান্ত্রিক চিন, পুঁজিবাদী জাপান ও সামন্ততান্ত্রিক ইথিওপিয়ার সহাবস্থান ঘটেছিল। তাছাড়া নির্জোটি দেশগুলি তো ছিলই। অর্থাৎ এই সমাবেশে বিভিন্ন মত ও পথ অনুসরণকারী দেশের সমাবেশ ঘটেছিল। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে অবশ্য আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সাম্যবাদী চিন সম্পর্কে এশীয় দেশগুলির উদ্বেগ ও ভীতি কিছুটা যেমন প্রশমিত হয়েছিল, তেমনই ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করেছিল যে, এশীয় সমস্যা ও প্রশ্নে এশীয় দেশগুলিকে উপেক্ষা করে তারা নিজেদের ইচ্ছা জোর করে চাপাতে পারবে না। ইন্দোনেশিয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও নেহরুর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে জুডিথ ব্রাউনের মন্তব্য- "Nehru's own contribution was obvi-ously a major one, and these was some feeling among delegates that he was attempting to play too dominant a role. "১৩ সাংবাদিক দুর্গা দাসের ভাষ্য থেকে জানতে পারি যে, বান্দুং-এর আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনিই নার্কি চিনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও-এন-লাইকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাসের ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ঝাও-এন-লাই-কে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। ১৪ এশীয় ভূখণ্ডে শান্তি স্থাপনে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য চার্চিল একদা তাঁকে 'এশিয়ার জ্যোতি' বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন।১৫

তবে এই সম্মান ও প্রতিপত্তি অনেকেই, বিশেষত ঝাও-এন-লাই খুব একটা পছন্দ করেননি। আসলে ঝাও-এন-লাই নিজেই এই সমাবেশে প্রধান ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিলেন এবং নেহরুর উপর নির্ভরশীল হতে চাননি। এই মনোভাব অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেননি। যাইহোক, এই সম্মেলনে তিনি আফ্রো-এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দেন যে, চিন কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, আফ্রো-এশিয়ার সমস্ত দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিন পঞ্চশীল নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বান্দুং সমাবেশে পঞ্চশীল নীতির সঙ্গে অতিরিক্ত আরও পাঁচটি নীতি সংযোজিত হয়েছিল। সেগুলি হল-(১) মৌলিক মানব অধিকার ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সংযোজিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন; (২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে একক ও যৌথভাবে সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি; (৩) যৌথভাবে কোনো বৃহৎ শক্তির প্রতিরক্ষার স্বার্থপালন থেকে বিরত থাকা এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি না করা; (৪) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপস, আলাপ আলোচনা, সালিশি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ ও মনোমালিন্যের মীমাংসা ও (৫) ন্যায়নীতি ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।) ঝাও-এন-লাই-এর এইসব আপসকামী ও সহকর্মীসুলভ প্রতিশ্রুতির ফলে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কাছে চিনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল এবং শান্তিকামী প্রতিবেশী হিসাবে অনেকের কাছেই চিন বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। সাংবাদিক দুর্গা দাসের মতে, বান্দুং থেকেই চিন এশীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে তৎপর হয়। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের সঙ্গে চিনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের বীজও এখানেই বপন করা হয়। ("The seeds of China's subsequent friendship with Pakistan were also sown at Bandung. "১৬) কাজেই দেখা যাচ্ছে, নেহরুর পাশাপাশি ঝাও-এন-লাইও বান্দুং সমাবেশে একটি নিজস্ব জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বি.এন. পান্ডে তাই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বান্দুং সমাবেশে ভারত ও চিন উভয়েই সমান তালে পাল্লা দিয়েছিল। ("India and China represented the two giants of Asia at the conference. "১৭) এই অবস্থায় আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির নেতা হিসাবে ভারত ও চিনের মধ্যে

Edit with WPS Office

প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য ছিল। তবে জোট নিরপেক্ষ নীতির নেতা হিসাবে বান্দুং-এ নেহরুই অবিসাংবাদিতভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

নিজোট আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে নেহরু বান্দুং-এ কতটুকু সাফল্য লাভ করেছিলেন, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে। সর্বপল্লী গোপাল বলেছেন-"জয়ের অর্থ যদি অংশগ্রহণকারী দেশগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার হত, তাহলে বান্দুং সম্মেলন প্রকৃতপক্ষে নেহরুর জয়কে সূচিত করল না।”১৮ আসলে নানা মত ও পথের পথিক এতগুলি দেশকে এক সঙ্গে নিয়ে চলা এবং তাদের সংঘবদ্ধ করা কার্যত অসম্ভব ছিল। বস্তুত, "বান্দুং এর পরে পরেই 'জোট' ও 'নিজোট' নীতির অসামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়ে উঠল ও সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির পথ আবার বিভক্ত হল। তুরস্ক আগের মতেই NATO-তে রয়ে গেল; ফিলিপাইনস্, থাইল্যান্ড বা পাকিস্তান SEATO-য়; আর ইরাক বাগদাদ সন্ধি চুক্তিতে....."১৯ ভারত ও মিশর ছাড়া অন্য কোনো বড়ো রাষ্ট্র জোট নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তবে এই আন্দোলনের ব্যর্থতাকে বড়ো করে দেখানো অনুচিত। এই ধরনের সমাবেশ যে গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটাই বড়ো কথা। "আফ্রো-এশীয় সংহতির ধারণা কিন্তু হারিয়ে গেল না। বান্দুং-এ পোঁতা তার বীজ ফুলে ফলে বড়ো হল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে দুই নতুন প্রক্রিয়া তথা নির্জেটি আন্দোলন ও আফ্রো-এশীয় সংহতি রূপে সমান্তরালভাবে বিকাশলাভ করল।”২০ অন্যদিকে বান্দুং সম্মেলনে নেহরুর ভূমিকা, বিশেষত, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে রাশিয়ার উপনিবেশ হিসাবে স্বীকৃতি দানে তাঁর অস্বীকৃতি, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর পথ প্রশস্ত করেছিল। পাওনা হিসাবে এটিও কম নয়। তাছাড়া নির্জোট আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়নি, তার আর একটি প্রমাণ ১৯৫৬ সালে যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটো নেহরু ও নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই আন্দোলনের শরিক হন। ফলে এই আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ পেয়েছিল। তবে এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

Edit with WPS Office

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন(Non alignment movement):

ভারত যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন তার নিজস্ব কোনো পররাষ্ট্র নীতি ছিল না। ইংল্যান্ডের স্বার্থে ভারতকে ব্যবহার করা হত। তবে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের, বিশেষভাবে নেহরু এবং সাধারণ মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। যেমন, রুশ বিপ্লব ভারতের মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'রাশিয়ার চিঠি'। ১৯৩০-এর দশকে যেখানেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ঘটেছিল যেমন, চিনে জাপানি আক্রমণ, আবিসিনিয়ায় ইটালির অভিযান এবং হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-নেহরু তার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেছিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তাঁর সমর্থন ছিল গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস চিনে কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে গঠিত একটি চিকিৎসক বাহিনী পাঠিয়েছিল। মুসলিম সংগঠনগুলি আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল মূলত তাত্ত্বিক আগ্রহ। ১৯৪৭ সালের পর ভারত স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করার সুযোগ পায়।

স্বাধীন ভারতে পররাষ্ট্র নীতির রূপকার ছিলেন স্বয়ং নেহরু, যিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরুদায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির মূল বা গোড়ার কথা হল জোট নিরপেক্ষতা। ঠান্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে যখন সমগ্র বিশ্ব কার্যত দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত, তখন নেহরুর নীতি ছিল উভয় গোষ্ঠী থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে কোনো পক্ষেই সরাসরিভাবে যোগদান না করা। স্বাধীনতার প্রায় এক বছর আগে ১৯৪৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্য দেশের তাঁবেদার হিসাবে নয়, বরং সম্পূর্ণ এক স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারত তার নিজস্ব নীতি অনুসরণ করবে। স্বাধীনতার পর নেহরু মনে করতেন, এশিয়া ও আফ্রিকায় যেসব দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বা করতে চলেছে, তাদের পক্ষে দুই বৃহৎ গোষ্ঠীর এই শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদানে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, সুস্থ সমাজ গঠন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। পরস্পরবিরোধী দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের সঙ্গে তাদের এই নিজস্ব লড়াই-এর কোনো সম্পর্ক নেই। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এশিয়া ও আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলিকে ব্যবহার করতে চাইছে। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত এইসব দেশের প্রয়োজন যুদ্ধ নয়, শান্তি। যুদ্ধ বা সংঘাত তাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। তাদের উচিত ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা, পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং সর্বপ্রকার সংঘাত ও বিশ্বশান্তির পথে যেসব বাধা আছে, তা অপসৃত করা। এইভাবে তিনি জোট নিরপেক্ষতাকে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে উত্তীর্ণ করতে সচেষ্ট হন। তিনি ছিলেন নির্জোট আন্দোলনের পথিকৃৎ।

জোট নিরপেক্ষতা বলতে নেহরু সর্বাগ্রে বুঝতেন কোনো দেশের রাজনৈতিক স্বনির্ভরতা বা স্বাধীনতা। তাঁর দৃষ্টিতে জোট নিরপেক্ষতা কোনো মধ্যপথের রাজনীতি নয়। এ হল ইতিবাচক, গঠনমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি, যা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য; তবে অন্য দেশ আক্রমণ করলে অবশ্যই তার প্রতিরোধ করতে হবে। নতুন করে বিশ্বযুদ্ধ হলে তা থেকে দূরে থাকা কষ্টকর হলেও সম্ভব হলে তা এড়াতে হবে; নচেৎ যে পক্ষে থাকলে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল হবে, সে পক্ষে থাকতে হবে। যুদ্ধ এড়িয়ে চললেও বা কোনো পক্ষেই যোগদান না করলেও উভয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে নেহরু আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ভাষায়-"We must be friendly to both and yet not join either."৩ আসলে তিনি চেয়েছিলেন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত শক্তির সঙ্গেই সুসম্পর্ক স্থাপন করতে। তবে তা করতে গিয়ে তিনি কখনোই তাঁর মূল নীতির সঙ্গে আপস করতে

Edit with WPS Office

রাজি ছিলেন না।

জোট নিরপেক্ষতা বলতে নেহরু অবশ্যই আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সংঘাত সম্পর্কে উদাসীনতা বা না-হস্তক্ষেপ নীতি বোঝাতেন না। ভারত নিজেকে তার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুক বা বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন বা সম্পূর্ণরূপে অনাগ্রহী হোক, তা তিনি চাননি। তিনি মনে করতেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই ধরনের নিস্পৃহতা বা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে রাখার কোনো অবকাশ নেই। আসলে চারদিকে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলির প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে বা সব কিছু ভালোভাবে খতিয়ে দেখে, যা সত্য বা ন্যায়, সঠিক বা ভ্রান্ত, তা বিচার করার যে স্বাধীনতা, তাকেই তিনি জোট নিরপেক্ষতা বলতেন। যে অর্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সুইজারল্যান্ড বা সুইডেন নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিল, তার সঙ্গে নেহরু অনুসৃত জোট নিরপেক্ষতার কোনো মিল ছিল না। সুইজারল্যান্ড পৃথিবীর কোনো ব্যাপার নিয়েই মাথা ঘামাত না। কেন ভারতের পক্ষে সবসময়ে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়, নেহরু তার উত্তরও দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় -"Where freedom is menaced, justice threatened or where aggression takes place, we cannot and shall not be neutral." 8

এখন প্রশ্ন হল, নেহরু কেন জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেন? ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষাই কি একমাত্র লক্ষ্য ছিল? আদর্শবাদই কি তাঁর মূল প্রেরণা ছিল? বস্তুত, এইসব কারণ ছাড়া আর একটি বাস্তব কারণেও তিনি জোট নিরপেক্ষতার কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি

ভালোভাবেই জানতেন যে, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে দুর্বল ভারতের পক্ষে কখনোই দুই শক্তিধর গোষ্ঠীর মধ্যে কোনোপ্রকার মধ্যস্থতা করা বা ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, ভারতের মতো একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ যদি উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোনো একটিতে যোগদান করে, তাহলে শক্তির ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে, যা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক। অপরপক্ষে জোট নিরপেক্ষ ভারত উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একটি নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। মাইকেল ব্রেচারের ভাষায়-An uncommitted India can perform and has performed in some measure, the necessary task of building a bridge which otherwise would not exist between the two blocks."৫ এই কারণেই তিনি জোট নিরপেক্ষ নীতিকে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। নির্জোট আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে একটি দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়েও নেহরু চেয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে ভারতের ও নিজস্ব ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে। তিনি তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ভারত কারও চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য নয়।

নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতি কিন্তু ঘরে বাইরে সর্বত্র কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State) জন ফস্টার ডালেস ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। তিনি ও নেহরু কেউই কাউকে পছন্দ করতেন না। ভালেস জোট নিরপেক্ষ নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলেছিলেন- "The concept of neutrality is obsolate, im-moral and short-sighted." যারা এই নীতিতে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের 'ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট' বলে অভিহিত করেন। ঠান্ডা লড়াই-এর একনিষ্ঠ সাধক ডালেসের দৃষ্টিতে মুক্তপন্থী দুনিয়া ও বিশ্বশান্তির পক্ষে নিরপেক্ষতা নীতি একটি মারাত্মক উদ্বেগের কারণ ও ভীতির প্রতীক। এমনকী প্রথম দিকে সোভিয়েত রাশিয়াও এই নীতি সুনজরে দেখেনি। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত নেহরুর বোন বিজললক্ষ্মী পণ্ডিতের

Edit with WPS Office

সঙ্গে স্ট্যালিন দেখা করতে পর্যন্ত চাননি। রুশদের দৃষ্টিতে নেহরু ছিলেন The running dog of imperialism। পশ্চিমের দৃষ্টিতে নেহরু ছিলেন কমিউনিস্ট ঘেঁষা এবং মার্কিন বিরোধী। চিনের দৃষ্টিতে ভারত ছিল আধা উপনিবেশ; নেহরু ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ও ইঙ্গ-মার্কিন চর। মাও-জেদঙ-এর দৃষ্টিতে নেহরুর নীতি ছিল অনভিপ্রেত।

দেশের অভ্যন্তরে শুধু বিরোধী নেতারাই নয়, কংগ্রেসের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাও নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতির সমালোচনা করেছিলেন। আচার্য জে. বি. কৃপালিনী বলেছিলেন-"We have no friends left in the world."৭ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরুর নীতিকে অবাস্তব বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে ভারত নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম কি না তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ হবার নীতির পক্ষে ছিলেন। মিনু মাসানিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর পক্ষে ছিলেন। শিল্পপতি জি. ডি. বিড়লা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নেহরু কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে যেমন ব্যর্থ হয়েছিলেন, তেমনি অনেক রাষ্ট্র তাঁর উপর বিরূপ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। নেহরুর নিজের দলের অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেননি। সবচেয়ে কঠোর ও তীক্ষ্ণ সমালোচক ছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি ঘরে বাইরে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সাবধান করে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অনুসরণের কথা নেহরুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। চিনের মতিগতি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সন্দিহান ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে। এইসব বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও নেহরু তাঁর নীতিতে অবিচল ছিলেন। তবে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যাটেলের মৃত্যু না হলে হয়তো তাঁকে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়তে হত এবং নেহরু-প্যাটেল বিরোধিতার পরিণতি কী হত, তা বলা কঠিন।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ঠান্ডা লড়াই-এর উত্তেজক পরিস্থিতিতে, প্রথম দিকে (১৯৪৭-৫১) নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতি কার্যকর করা অত্যন্ত দুরুহ, কার্যত অসম্ভব ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া বা চিন-কারও সঙ্গেই ভারতের সুসম্পর্ক ছিল না এবং কারও দৃষ্টিতেই এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। স্ট্যালিন যে ভারতের প্রতি সদয় ছিলেন না, সে-কথা আগেই বলেছি। স্বাধীনতার পরে ভারতে যে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা গিয়েছিল, তার মোকাবিলা করতে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সক্রিয় সহায়তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ মিলিয়ন টন খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নেহরু তা গ্রহণ করতে ইতস্তত করেছিলেন। এই সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু সেই সাহায্যের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু দাবি অবশ্যই করতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। ফলে তিনি কিছুটা উভয় সংকটে ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন- "Whatever we may feel like doing. এই ধরণের উপহার কিছু বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, এতে কোন সন্দেহ নেই।" ৮ বিঃ

শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিতে তার আপত্তি ছিল না। রাষ্ট্রপতি টুম্যানও নেহরুর পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এই সাহায্যের পিছনে আমেরিকার কোনো দুরভিসন্ধি ছিল বলে মনে হয় না। নেহরু মাও-জেদঙ-এর মন জয় করতে আগ্রহী হলেও মাও তাঁকে ঠিক বিশ্বাস করতেন না। এই প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও নেহরুর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি শেষ পর্যন্ত জোট নিরপেক্ষ নীতিকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Edit with WPS Office

জোট নিরপেক্ষতার প্রয়োগ:

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে উভয় দেশের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। দুটি দেশই ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। দুটি দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মিশ্র সংস্কৃতির প্রচলন ছিল। দ্বিতীয়ত, নতুন ভারত গড়ার কাজে ভারতের পক্ষে সক্রিয় মার্কিন সাহায্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। খাদ্য ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার যথার্থ রূপায়ণে ভারতের পক্ষে আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ছিল। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল। এশিয়ার একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল। ঠান্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাম্যবাদের প্রসার রোধে, বিশেষত, ১৯৪৯ সালে সাম্যবাদী চিনের আবির্ভাবের পর, ভারতের সঙ্গে মৈত্রী বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুবই কাম্য ছিল। চতুর্থত, ভারতের প্রতি স্ট্যালিনের শীতল মনোভাব ভারত-মার্কিন মৈত্রীর পথ মসৃণ করেছিল। সবশেষে, ভারতের অনেক নেতাই ছিলেন দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন এবং তাঁরা ভারত-মার্কিন মৈত্রীর সমর্থক ছিলেন। জোট নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও নেহরু প্রথম দিকে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেন যে-"I want to be friendly with the Amercicans but always making it clear what we stand for. I want to make no commitments which come in the way of our basic policy."৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারত তার দোসর হবে। কিন্তু কাজটি যে মোটেই সহজ ও সরল নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা বুঝতে পেরেছিল। নেহরু ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন নীতি ও সমর্থন নেহরুকে মার্কিনবিরোধী করেছিল। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে যখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন, তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়া-কোনো পক্ষেই যোগদান করবে না এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে। ঠান্ডা লড়াই-এর প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতি মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। এমনকী যেসব মার্কিন নাগরিক নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তাঁদের কাছেও নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতি বোধগম্য হয়নি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, নেহরু কোনো-না-কোনো সময়ে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, মুক্তপন্থা ও সাম্যবাদের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান বাস্তবসম্মত নয়।

আশ্চর্যের কথা যে, নেহরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ না হওয়ায় সোভিয়েত রাশিয়া পুলকিত হয়নি। সোভিয়েত নেতাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সত্ত্বেও ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লেজুড়। সোভিয়েত দৃষ্টিতে ভারতের ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগদান ছিল একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। নেহরুর নীতি ছিল কোনো জোটে যোগদান না করলেও প্রত্যেক দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। কিন্তু স্ট্যালিনের রাশিয়ার সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা খুব কঠিন, নেহরু তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মস্কোকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ভারত ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তল্পিবাহক নয়। কিন্তু তাতে চিড়ে ভেজেনি এবং ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি। অন্যদিকে নেহরু ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও এবং সোভিয়েত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমর্থক হলেও রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচক ছিলেন। আসলে নেহরুর লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করা; তিনি কোনোপ্রকার রাজনৈতিক সম্পর্কের জালে ভারতকে জড়াতে চাননি। রাশিয়ার প্রতি তাঁর নীতি কী ছিল, তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন-"It is a little difficult to become really friends with a country which adopts a hostile attitude,

Edit with WPS Office

or which expects you to become just a camp-follower. That we are not prepared to do on any account....Our attitude to the U.S.S.R. should be as friendly as possible subject to all this. We are not getting tied up in any way with its (Russia's) world politics some of which we disapprove.... We want peace and avoidance of world war."১০

স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছর (১৯৪৭-১৯৫৬) নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়া কারোরই মনঃপূত হয়নি, সে-কথা নেহরু স্বীকার করেছেন। এর ফলে যে বিশ্ব রাজনীতিতে কোনো প্রভাবই পড়েনি, সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। বরং এই নীতির ফলে ভারত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আচার্য কৃপালিনীর অভিযোগ যে, পৃথিবীতে আমাদের কোনো বন্ধু নেই ("We have no friends left in the world.")-পুরোপুরি ভিত্তিহীন ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হতোদ্যম হননি বা নিজ নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বলেছিলেন- "The idea that we can get some immediate end by alignment with one of the power blocs is essentially wrong. If once we do so, we will even lose our bargaining power, even though we may gain some petty temporary advantage. "১১ তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, ভারত যদি জোট নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে, তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও হয় এ পক্ষে, নয় ও পক্ষে যোগদান করতে বাধ্য হবে এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। সাময়িক এই ব্যর্থতায় উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তা কিছুটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই নীতি অনুসরণ করলে যে আখেরে ভালোই হবে, সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এই নীতি অপরিহার্য বলেই তিনি মনে করতেন।

প্রাথমিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও নেহরু তাই তাঁর প্রয়াস চালিয়ে যান। ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলসকে (Chester Bowles) ১৯৫১ সালে তিনি বলেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের সাম্যবাদী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বিশ্বের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে বলে তিনি মনে করতেন না। কেবলমাত্র সামরিক জোটের মাধ্যমে সাম্যবাদকে রোখা যায় না বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সাম্যবাদ নয়, জাতীয়তাবাদই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রধান চালিকা শক্তি। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্ক কত দিন স্থায়ী হবে, তা নিয়ে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এমনকী স্ট্যালিনোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ায় যে উদারীকরণের হাওয়া বইবে, এই রকম একটি ধারণাও নেহরুর ছিল। তবে তাঁর এই ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেনি। অন্যদিকে ভারতের আগ্রহে যখন ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতি নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিতর্ক হয়, তখন সোভিয়েত রাশিয়া আগাগোড়া ভারতের পক্ষে ছিল। জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই নীতি নেহরুকে সন্তুষ্ট করেছিল। এর ফলে দুটি দেশ অদূর ভবিষ্যতে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এশীয় নীতি ভারত-মার্কিন সুসম্পর্কের পথে একটি বড়ো বাধা ছিল। প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানে ইঙ্গ-মার্কিন নীতি নেহরুর মনঃপূত ছিল না। তিনি প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন। একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে তিনি এই সমস্যার সমাধানসূত্র নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। এই যুক্তরাজ্যে আরব ও ইহুদি উভয়েই স্বশাসনের অধিকারী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা জটিলতর হয়েছিল এবং তা স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সহায়ক হয়নি। দ্বিতীয়ত, দূরপ্রাচ্যে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে কয়েকটি

Edit with WPS Office

ঘটনা ঘটে, যা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম ঘটনা হল ১৯৪৯ সালে সাম্যবাদী চিনের অভ্যুত্থান। এর ফলে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি আরও কঠোর হয়। অন্যদিকে যদিও মাও-জেদঙ জোট নিরপেক্ষ নীতির সমালোচক ছিলেন, নেহরু তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, জোট নিরপেক্ষ নীতির অঙ্গ হিসাবেই ভারত সাম্যবাদী চিনকে স্বীকৃত দিতে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তার 'প্রবেশাধিকার নিয়ে সুপারিশ করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, ভারতের চিন নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। ১৯৪৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভারত সাম্যবাদী চিনকে স্বীকৃতি দেয়। এর পর ১৯৫০ সালে জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডও চিনকে স্বীকৃতি দেয়। ইংল্যান্ডের এই স্বীকৃতির পিছনে নেহরুর হাত ছিল। ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে ভারতে ফেরার পথে তিনি লন্ডনে ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। চিনকে স্বীকৃতি দানের পিছনে অবশ্য তাঁর একটি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তা হল এর ফলে চিন রাশিয়ার দিকে ঘেঁসবে না। এই লক্ষ্য অবশ্য পূর্ণ হয়নি এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন মৈত্রসূত্রে আবদ্ধ হয়। নেহরুর চিন নীতি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ হয়নি, তেমনই যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিকে ওয়াশিংটনে উষ্ণ অভিনন্দন জানায় এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে, তাও নেহরুর পছন্দ হয়নি। পানিক্করকে তিনি লিখেছিলেন-"In effect Pakistan becomes politically a colony of United States." কিছুটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতবিরোধী নীতিতে উদ্বিগ্ন হয়েই নেহরু ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগদান করার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মাধ্যমে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করা এবং একটি যোগসূত্র স্থাপন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির ফলে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, তা পূরণ করার জন্যই তিনি ব্রিটেনের কাছে আসতে চেয়েছিলেন।

Edit with WPS Office

নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির মূল্যায়ন:

পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে ও প্রয়োগে নেহরুই ছিলেন শেষকথা। এই বিষয়ে মন্ত্রিসভার আলোচনায় তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের মধ্যেও তাঁর প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। সংসদে অবশ্যই বিরোধী নেতারা অনেক সময় তাঁর কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জাতি, এমনকী অধিকাংশ সংবাদপত্রও ছিল তাঁর সমর্থক। ১৯৬২ সালের চৈনিক আক্রমণের পর অবশ্য নেহরুকে তাঁর পররাষ্ট্র নীতির জন্য কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। যাইহোক, কোনো মানুষই সম্পূর্ণ এককভাবে কোনো কাজ করতে পারেন না। প্রখর ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও নেহরুও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্য অনেকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর পরামর্শ দাতাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ছিলেন। মন্ত্রীদের মধ্যে কৃষ্ণ মেনন ছিলেন তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁর উপর তিনি অনেকটাই নির্ভর করতেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির বিষয়ে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের সময় তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন আজাদ ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর স্ত্রী, নিজের বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বিখ্যাত দার্শনিক ড. রাধাকৃষ্ণন ও সর্দার কে.এন. পানিক্কর। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শেই তিনি কাশ্মীর প্রসঙ্গ জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করেছিলেন। প্রথম দিকে তিনি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উপর অনেকটাই নির্ভর করতেন। স্ট্যালিনের সময় রাশিয়ার ব্যাপারে তিনি কথাবার্তা বলতেন ড. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণন জোট নিরপেক্ষ নীতির সমঝদার ছিলেন। আজাদ ছিলেন আরব রাষ্ট্রগুলির কাছে সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত। ভারত ও মুসলিম দুনিয়ার মধ্যে তিনি সেতুবন্ধনের কাজ করতেন। চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক আদানপ্রদানে পানিক্কর অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি ছিলেন চিনের রাষ্ট্রদূত। তবে নেহরুর ডানহাত ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। নেহরু সব বিষয়েই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের দুটি প্রধান দিক হল-আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর ও সামগ্রিকভাবে ভারতের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি। প্রথমটিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। ১৯৫০-এর দশকে আন্তর্জাতিক স্তরে নেহরু তথা ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং ভারতের মতো দরিদ্র ও অনগ্রসর একটি দেশের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। বিশ্বে শান্তি স্থাপনে নেহরু আইনস্টাইন ও বার্টান্ড রাসেলের মতোই আগ্রহী ছিলেন এবং হয়তো তিনি তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে ১৯৬২ সালের চৈনিক আক্রমণের পর নেহরু ও ভারতের মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য জোট নিরপেক্ষ নীতি ও সদ্যস্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশগুলি নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব আন্দোলন গঠন। সারা বিশ্ব যখন দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি শিবিরে বিভক্ত হবার মুখে, তখন নেহরুর এই নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা আরোপ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্র ছিল ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি। তখন অবশ্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি স্বাধীন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও ঠান্ডা লড়াই-এর সুবাদে পশ্চিমি রাজ্যগুলির বিরোধ ও সংঘাত ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল সূত্র। নেহরুই প্রথম জোট নিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে এই তত্ত্ব তুলে ধরলেন যে, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি পশ্চিমি রাজ্যগুলির হাতের পুতুল নয়। তাদেরও নিজস্ব মত ও পথ আছে। ভি.পি.দত্ত মন্তব্য করেছেন-"To him (Nehru) the major question of the day was not the mutual antagonisms of European countries but the readjustment of relations between Asia and Eu-rope."৩৪ নেহরু এই

Edit with WPS Office

সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীন দেশগুলির কাছে পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, উন্নয়ন ইত্যাদি সমস্যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় রাজ্যগুলির বিরোধে থাকার কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পশ্চিমি দেশগুলি যদি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চায়, তবে তাদের উচিত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া। একমাত্র এইভাবেই সারা বিশ্বে শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব। বস্তুত, ভারত এই সময় ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়ার সাহায্যে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছিল। বিপান চন্দ্র বলেছেন-"Non alignment was not a blueprint for policy, it was an approach, a framework, a method, not a strait-jacket but a lodestar by which the young nation could steer its course in the dark night.৩৫ কেউ কেউ এই নীতির মধ্যে হয়তো এক ধরনের সুবিধাবাদ লক্ষ করতে পারেন। অর্থাৎ কোনো পক্ষেই যোগদান না করে উভয় পক্ষের কাছ থেকেই সুযোগসুবিধা আদায় করার একটা পথ এতে খোলা ছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন- "প্রশ্ন ওঠে-তবে কি তাঁর বহুল-প্রচারিত non-alignment আসলে সুবিধাবাদ? এস. গোপাল তাঁকে সমর্থন করলেও আমি করতে পারছি না।”৩৬ নেহরু কিন্তু বিষয়টিকে ঠিক এভাবে দেখেননি। তিনি এই নীতিকে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। এর মাধ্যমে তিনি সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কোরীয় সংকট, সুয়েজ সংকট, ভিয়েতনাম প্রভৃতি সংকটে তাঁর ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির অনুপ্রেরণা ছিল যুক্তিবাদ। এর পিছনে আবেগের কোনো স্থান ছিল না। কঠোর বাস্তববাদ ছিল এর মূল ভিত্তি। এই নীতি অনুসরণ করে ভারতের লাভ বই ক্ষতি হয়নি।

তবে এই নীতি অনুসরণ করা সহজসাধ্য কাজ ছিল না। এর সাফল্যের জন্য সাহস, ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম কূটনৈতিক দক্ষতা ছিল অত্যন্ত আবশ্যিক শর্ত। উভয় পক্ষেরই সন্দেহ ও বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই নীতির ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের উত্তেজক পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে নির্বান্ধব হওয়ার আশঙ্কা সব সময়েই ছিল। কৃপালিনী এই আশঙ্কার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্তও করেছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ই ভারতকে সুনজরে দেখেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণে ঠান্ডাযুদ্ধের সময় জোট নিরপেক্ষতা ছিল অবাস্তব। স্ট্যালিন ভারতকে বিশ্বাস করতেন না। এমনকী চিনও ভারতকে ভালো চোখে দেখে নি। এই অবস্থায় নেহরুকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরেও তাঁকে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শুধু দুই শক্তিধর রাজ্যের মধ্যে সমদূরত্ব রক্ষা করে চলাই নয়, সেই সঙ্গে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির আস্থা অর্জন করা এবং তাদের জোট নিরপেক্ষ নীতি আন্দোলনের শরিক করাও সহজসাধ্য কাজ ছিল না। দুটি ক্ষেত্রেই নেহরু যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির যে স্বতন্ত্র সত্তা এবং তাদের যে নিজস্ব মর্যাদাবোধ ও গুরুত্ব আছে, নেহরুই তা তুলে ধরেছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিমেরুকরণের তত্ত্বের অসারতা তিনিই প্রমাণ করেছিলেন।

অনেকেই অভিযোগ করেছেন নেহরু সবসময়ে কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করতে পারেননি এবং অনেক সময়ই তিনি সমদূরত্ব বজায় রাখতে পারেননি। বি. আর. নন্দ বলেছেন- "The non-alignment movement remained somewhat amorphous and loosely-knit....."৩৭ নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির প্রধান ভিত্তি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধন। কাশ্মীর সমস্যায় ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠতা ছিল না; বরং সাধারণভাবে তিনি মার্কিনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে নেহরুর মার্কিন বিরোধিতা

Edit with WPS Office

প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে ক্রুশ্চেভের সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে, হাঙ্গেরি সংকটে ভারত রাশিয়াকে সমর্থন না করলেও কঠোরভাবে সমালোচনা করেনি। অথচ প্রায় একই সময়ে সুয়েজ সংকটে ভারত কঠোরভাবে এই আক্রমণের নিন্দা করেছিল। অর্থাৎ এই সংকটে তাঁর ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। এইসব অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়। হাঙ্গেরি সংকটে তাঁর ভূমিকায় কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল। যে-কোনো কারণেই হোক, হাঙ্গেরি সংকট নিয়ে নেহরু যথাযথ তৎপরতা দেখাতে পারেননি। এক্ষেত্রে তিনি জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি তাঁর নীতিতে অবিচল ছিলেন। এমনকী চৈনিক আক্রমণের সময়েও তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলেও কারও সঙ্গেই সরাসরি কোনো মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হননি এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। এ কথা সত্য যে, ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ভারতের সঙ্গে তার সুসম্পর্কের কোনো সুযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের মতভেদের কারণ ছিল ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব। নীতিগত প্রশ্নেই উভয়ের মধ্যে মতের এবং মনের মিল হয়নি। চৈনিক আক্রমণ অবশ্য দুটি দেশের মধ্যে কিছুটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল। জোট নিরপেক্ষতা কোনো অচল ও অনড় তত্ত্ব ছিল না। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। অনেক সময় অভিযোগ করা হয় যে, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে নেহরু আদর্শবাদ ও নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। এই অভিমত অবশ্যই অযৌক্তিক নয়। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, নেহরু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জোট নিরপেক্ষতা, অহিংসা ও শান্তি, আন্তর্জাতিকতা, মানবতাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ বিরোধিতা প্রভৃতি মহৎ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। ন্যায় ও নীতির পক্ষে সব সময়েই তিনি অবিচল ছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কল্পনাবিলাসী ছিলেন এবং তাঁর অনুসৃত নীতিতে বাস্তবতার কোনো স্থান ছিল না। আসলে তাঁর নীতির মধ্যে আদর্শবাদ ও বাস্তবতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। ভারতের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সব সময়েই সচেতন ছিলেন এবং তার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি ছিলেন। তিনি জানতেন যে, আদর্শবাদ ও নৈতিকতা সবসময়ে কঠোরভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতিতে কিছুটা দ্বিচারিতা অপরিহার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর যতই মতাদর্শগত পার্থক্য থাক, দেশের উন্নয়নে ও প্রয়োজনে তার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঐক্য নিয়ে যতটা আগ্রহী ছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ঐক্য নিয়ে তা ছিলেন না। ১৯৪৮ সালে তিনি যতটা কঠোরভাবে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, ইন্দোচিনে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে তা করেননি। রাজেন্দ্র প্রসাদ এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন- "In the United Nations France has sided with us on important issues. In regard to French possessions in India also their attitude, though somewhat dilatory, is not unfriendly and we hope to arrive at some settle-ment before very long. "৩৮ ১৯৫০ সালের মে মাসে শান্তিপূর্ণ পথে ফরাসি চন্দননগর ভারতের অধীন হয়। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরি সংকটে সোভিয়েত রাশিয়ার সমালোচনায় নেহরু যে সংযত ও সাবধানী মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন, তার পিছনেও ছিল ভারতের স্বার্থ। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরূপ সমালোচনা করে তিনি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীতে কোনো ফাটল ধরাতে চাননি। তিনি একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কোপে পড়ার আশঙ্কা করেছিলেন। এই আশঙ্কা যাতে বাস্তবে পরিণত না হয়, সে জন্যই তিনি রাশিয়াকে চটাতে চাননি। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যায় তিনি আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন মূলত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইসলামি দুনিয়ায় সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে। তাদের খুশি করার জন্যই তিনি তাদের জাত শত্রু ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের কোনো বিরোধ না থাকলেও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেননি।

Edit with WPS Office

অথচ মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত কোনো ঐক্য ছিল না। (অবশ্য নাসের এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন।) অন্যদিকে নেহরু মুখে শান্তির কথা বললেও সবসময়ে তিনি এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেননি। পোর্তুগিজদের হাত থেকে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে তিনি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন দীর্ঘ ১৫ বছর অপেক্ষা করার পর। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে ভারতের মাটি থেকে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন অপসৃত হয়। যাইহোক, নেহরুর পক্ষে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, হয়তো বলপ্রয়োগ করা ছাড়া ভারত থেকে পোর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদ বিলোপ করা সম্ভব হত না।

নেহরু যে. জোট নিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তার মধ্যে বাস্তবতার স্থান ছিল। এর অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ভারতের পক্ষে রাশিয়া পরিচালিত সাম্যবাদী গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না, কারণ ভারত একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র ছিল না এবং নেহরুও ব্যক্তিগতভাবে সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। কংগ্রেসও কোনো সাম্যবাদী দল ছিল না। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া যে সাম্যবাদী গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল, সেখানে কোনো অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রের স্থান ছিল না। আবার ভারতের পক্ষে পশ্চিমি গোষ্ঠীর সঙ্গেও হাত মেলানো অসম্ভব ছিল, কারণ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতের মূল সংগ্রামই ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। নেহরুর কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি নিজে শুধু এই নীতি অনুসরণ করেননি; আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ নিয়ে তিনি তাকে এক মহা আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। আসলে জোট নিরপেক্ষতা বলতে কোনো পররাষ্ট্র নীতি বোঝায় না। তা হচ্ছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র নীতি কার্যকর করার একটি মাধ্যমবা পদ্ধতিমাত্র। ঠান্ডা লড়াই-এর প্রেক্ষাপটে এক বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতেই নেহরু এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

নেহরুর পররাষ্ট্র নীতি সবটাই অভ্রান্ত ছিল বা তাঁর পররাষ্ট্র নীতি পুরোটাই সফল ছিল, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। কোনো মানুষই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত হতে পারেন না। তিনি চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধের কোনো মীমাংসা করে যেতে পারেননি। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান অবশ্য আজও হয়নি এবং ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আজও স্বাভাবিক হয়নি। তাঁর চিন নীতি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। সংসদে তাঁর পররাষ্ট্র নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জে. বি. কৃপালিনী, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রভৃতি নেতা। ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করলেও চিন, কোরিয়া, তিববত ও পাকিস্তানে তাঁর নীতির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ২১ আগস্ট ১৯৫৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তিববত প্রসঙ্গ উত্থাপন না করার জন্য নেহরুর সমালোচনা করেছিলেন। ওই বছর ২৫ নভেম্বর কৃপালিনী এক দীর্ঘ ভাষণে ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্যাটেল নেহরুর চিন ও পাকিস্তান নীতি সমর্থন করেননি; বরং অত্যন্ত কঠোরভাবেই সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা কোনো অংশে কম সাম্রাজ্যবাদী ছিল না।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর নীতিকে "ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি"৩৯ বলেছেন। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে তিনি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হওয়ায় তা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। নেহরু পরে এর জন্য আক্ষেপ করেছিলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে দুঃখ করে বলেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন জাতিপুঞ্জ নৈতিকতার চেয়ে রাজনীতির উপর

Edit with WPS Office

অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। একজন ব্রিটিশ সেনানায়ক মন্তব্য করেছিলেন- "Kashmir may remain a 'Spanish Ulcer." জেনারেল কারিয়াপ্পা নাকি যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্য নেহরুকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি। নেহরুর চিন ও তিববত নীতি নিয়ে অনেকেই কঠোর সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি একের পর এক নানা ভুল করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়। ১৯৫০ সালে চিন যখন তিববত আক্রমণ করে, তখন তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেননি। ১৯৫৪ সালে বান্দুং-এ তিনি অনাবশ্যকভাবে চিনকে তুলে ধরেছিলেন, যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন ঝাও-এন-লাই। ১৯৬২ সালের অনেক আগে থেকেই চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটলেও নেহরু তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমনকী চিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও তাঁর কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না বলে মনে করেন ভি.পি. দত্ত। চিনা আক্রমণে ভীত হয়ে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন চিন হয়তো আসামের পার্বত্য অঞ্চলে নেমে আসবে ও ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করবে। যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে তিনি পরপর দুটি চিঠি লেখেন কেনেডিকে, তা এর প্রমাণ। আসলে মোটেই তা চিনের উদ্দেশ্য ছিল না। দত্তের মতে, চিনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে শিক্ষা দেওয়া; তার ভাবমূর্তি ও জোট নিরপেক্ষ নীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং চিন যে ভারতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, তা সারা বিশ্বকে দেখানো। এই কারণেই চিন আচমকা যুদ্ধ বন্ধ করেছিল। যাইহোক, এ কথা স্বীকার্য যে, চৈনিক আক্রমণ নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির উপর একটি বড়ো আঘাত হেনেছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মন্তব্য- "ঐতিহাসিক হিসাবে, আমি নেহরুকে অবিবেচক, রণকৌশলহীন, রণসজ্জাহীন, অথচ ফাঁপা শান্তিকামী নেতা বলতে বাধ্য।"৪০ এই অভিমত হয়তো কিছুটা কঠোর ও অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। এই ধরনের ব্যাখ্যায় হয়তো নেহরুর সামগ্রিক অবদানের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তবু পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেহরু কিছুটা অবিবেচক ও বাস্তববোধবর্জিত নীতি অনুসরণ করেছেন বললে বোধ হয় কোনো অত্যুক্তি হবে না।

Edit with WPS Office